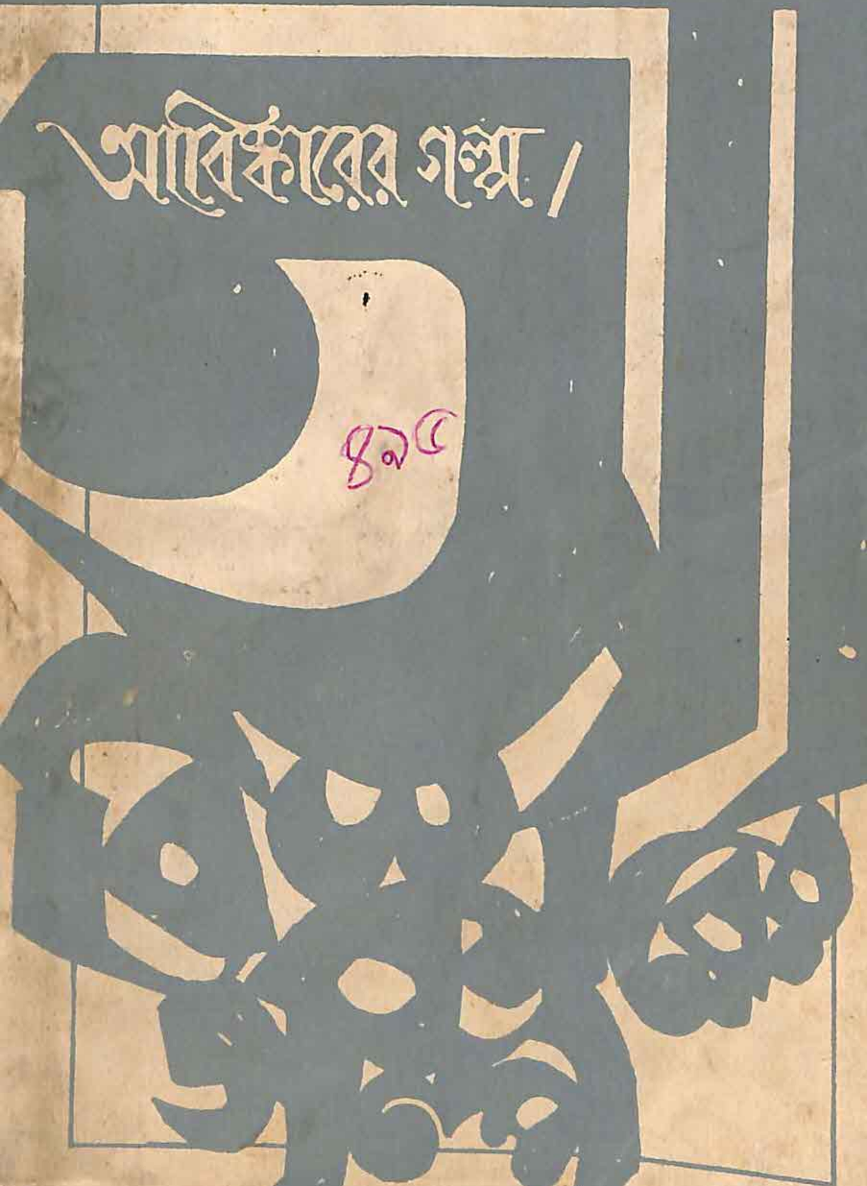
গ্রন্থ নিলয়

আবিষ্কারের গল্প



আবিষ্কারের গল্প

৪·৮

৪৯৫

অমরেন্দ্রকুমার সেন

গ্রন্থনিলয়
৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
চিন্ময় মজুমদার
৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮২

মুদ্রক :
শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

Acc No- 14734

মূল্য : ছয় টাকা

আবিষ্কারের গল্প

এতে আছে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে ছোটদের মনে অসীম কৌতূহল। তাদের শিশু-মনের কৌতূহল মেটাবার জন্যই এখানে কয়েকটি গল্প দেওয়া হল। ছোটরা খুশি হলে আমিও পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক



পৃথিবী আমাদের বাড়ি। আমরা অনেক দিন ধরে এই পৃথিবীতে বাস করে আসছি। পৃথিবীর সব দেশ আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। হিমালয়ের চূড়োয় উঠেছি, দক্ষিণ মেরু আর উত্তর মেরুতেও গিয়েছি, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ঘুরে এসেছি, প্রশান্ত কত অজানা অঞ্চল আমাদের জানা হয়ে গেছে। আজ আর আমাদের অজানা কোনো দেশ নেই।

পৃথিবী সূর্য থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে একটি গ্রহ। চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার পাক খায়। পাক খেতে খেতে সূর্যকে মাঝখানে রেখে ৩৬৫ দিনে এক বার ঘুরে আসছে। আমরাও পৃথিবীর ওপর চেপে বিনা টিকিটে ঘুরে আসছি।

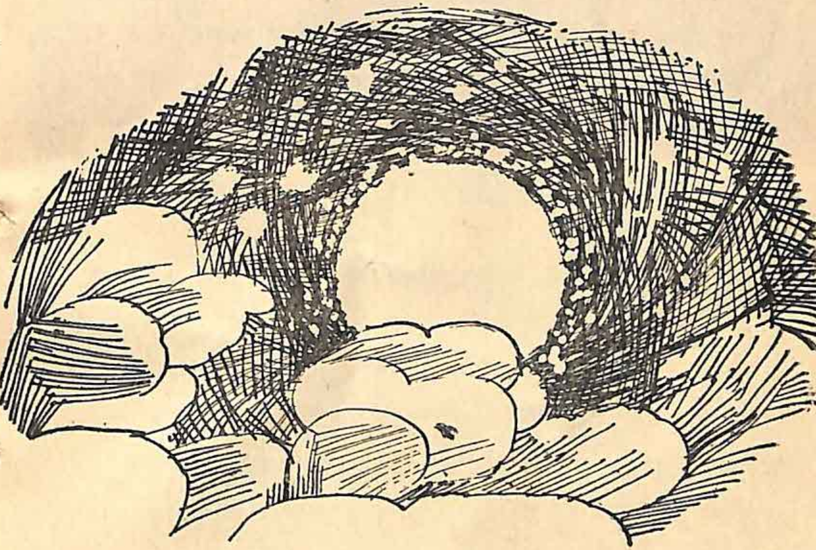
নতুন বাড়ি কিনলে আমরা তার সব খোঁজ খবর নিই। কবে সে বাড়ি তৈরি হল, কারা কারা 'সেই বাড়িতে বাস করেছে এই সব। একটা বাড়ি আর কত পুরানো হবে? পঞ্চাশ, ষাট কি এক শত বছর। কিন্তু আমাদের পৃথিবী-বাড়ি খুব পুরানো, কোটি

কোটি বছর। তখন পৃথিবীতে মানুষ ত দূরের কথা কোনো রকম জীবজন্তু পোকামাকড়, গাছপালা কিছুই ছিল না। পৃথিবীর কি করে জন্ম হল এই ইতিহাস লেখবার জন্যে তখন কেউ হাজির ছিল না। আমাদের এই পৃথিবী কত দিন আগে আর কী ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। পণ্ডিত লোকেরা নানারকম অনুমান করেছেন, আর কি করে এই অনুমান করলেন তার কিছু কিছু যুক্তিও দেখিয়েছেন।

ফরাসি দেশের লাপলাস এই রকম একজন পণ্ডিত লোক। তিনি বললেন যে কত কোটি বছর আগে কেউ জানে না, শূন্যে কোটি কোটি মাইল জুড়ে গ্যাসের মেঘ ছিল। সেই বিরাট গ্যাসের মেঘ নিজে নিজেই পাক খেত। পাক খেতে খেতে মাঝখানটায় এক বিরাট সূর্য সৃষ্টি হল আর তাকে ঘিরে সৃষ্টি হল নয়টি গ্রহ, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো এবং তাদের উপগ্রহ চন্দ্রদের। অনেকে এই মত মেনে নিলেন, অনেকে মেনে নিলেন না।

ইংলণ্ডের জীনস্ সাহেব বললেন, অনেক অনেক কোটি কোটি বছর আগে আমাদের সূর্যের কাছে তার চেয়েও বড় একটা নক্ষত্র এসে গিয়েছিল। সেই বড় নক্ষত্রের টানের ফলে সূর্যের গা থেকে বিরাট পটলের মতো একটা অংশ বেরিয়ে আসে। যার মাঝখানটা মোটা দু ধার সরু। এই পটল সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রত্যেকটি টুকরো হল এক একটি গ্রহ। পটলের মাঝখানে, যেখানটা মোটা ছিল সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে বড় বড় গ্রহ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদির : আর

দুধারের সরু অংশ থেকে ছোট ছোট গ্রহ—যেমন বুধ, শুক্র, পৃথিবী, নেপচুন ও প্লুটোর উৎপত্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য সেই বড় নক্ষত্রটি চলে গিয়েছিল।



হয়েল নামে আর একজন ইংরেজ বললেন যে আমাদের সূর্যের একটা সঙ্গী নক্ষত্র ছিল। সেই নক্ষত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাই থেকেই পৃথিবী আর অন্য সব গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে।

একজন জার্মান বিজ্ঞানী নতুন কথা বলেছেন। তাঁর নাম কার্ল ফন উইৎসাকার। তিনি বিশ্বাস করেন যে সূর্য একদা ঘুরতে ঘুরতে শূন্য আকাশে এক গ্যাসের রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। সেখান থেকে বেরুবার পর দেখা গেল যে তার গায়ে সেই গ্যাস দানা বেঁধে

জমে গেছে। সেই সব দানা-বাঁধা গ্যাস থেকেই একদিন পৃথিবী আর অন্য গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হক এই সকল পণ্ডিত লোকেরা যা বলছেন তা ঠিক না হলেও এ কথা ঠিক যে, আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই সত্যিই যে ভাবে হক সৃষ্টি হয়েছে আর আমরা তার ওপর বাস করছি। হিসেব করে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর বয়স তিন শত কোটি বছর।

বাড়ির খবর জানার সঙ্গে বাড়ির কোথায় কি ঘটছে তা-ও জানতে হবে, সে সব খবরও রাখতে হবে। তাই ত বিজ্ঞানের কিছু খবর রাখা দরকার॥



অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনধারাকে একেবারে বদলে দেয়, এমন অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় আবিষ্কারের মূলেও আছে অনেক দুর্ঘটনা।

কলম্বাস তিনখানা জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে, কিন্তু পোঁছোলেন যে দেশে সে দেশ ভারতবর্ষ নয়। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে নতুন দেশ আবিষ্কারও করলেন। বিজ্ঞান জগতেও এমনি এক করতে গিয়ে আর এক জিনিস ঘটে গেছে, তাতে পৃথিবীর উপকারই হয়েছে।

ইটালির বলোনা শহরে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল লুইজি গ্যালভানি। তাঁর স্ত্রী-এর নাম লুসিয়া। লুসিয়া বেচারী রোগে ভুগত, তার জন্যে ব্যাঙ-এর ঝোল গ্যালভানি নিজে রান্না করে দিতেন।

কোমর থেকে কাটা ব্যাঙ-এর পা দুটো একটা লোহার রড

থেকে তামার হুকে ঝোলানো আছে। পা দুটো এনে ফুটন্ত ঝোলে ফেলে দিতে হবে। গ্যালভানি কাঁটা দিয়ে ব্যাঙ-এর পা দুটো যেই তুলে আনতে গেছেন আর অমনি দেখলেন যে ব্যাঙ-এর একটা পা যেন চমকে উঠে সরে গেল। ব্যাঙ-এর সেই কাটা ঠ্যাঙ-এ ছুরি বা কাঁটা লাগলেই কাটা পা হঠাৎ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

গ্যালভানি ত আর সাধারণ মানুষ নন, তিনি একজন অধ্যাপক। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি একটি সদ্যোমৃত ব্যাঙ-এর ছাল ছাড়িয়ে পা দুটি কোমর থেকে কেটে নিয়ে লবণ জলে ডুবিয়ে লোহার রড থেকে তামার তারে গেঁথে ঝুলিয়ে দিলেন। পা দুটি এমনভাবে ঝোলালেন যাতে সামান্য হাওয়াতেই সে দুটি দোলে আর পাশের লোহার রডে ধাক্কা খায়। অবাক কাণ্ড! পা দুটি যতবারই লোহার রডে ধাক্কা খায় ততবারই পা দুটি যেন চমকে উঠে কুঁচকে ওঠে। ব্যাপারটা তখনকার লোকেরা ভৌতিক বলে মনে করেছিল কিনা জানি না, তবে এখন জানা আছে যে, ব্যাঙ-এর পেশীর আর্দ্রতা ধাতুর ছোঁয়া লেগে প্রতিক্রিয়া হওয়ার ফলে তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছিল। গ্যালভানি যখন ব্যাঙ-এর পা নিয়ে নানা পরীক্ষা করছিলেন তখন শহরের লোকে তাঁকে ঠাট্টা করে বলত, ব্যাঙ-নাচানো প্রফেসর।

গ্যালভানির এই পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ইটালির আর একজন অধ্যাপক ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি করলেন। তাঁর নাম ভোল্টা।

তারপর সেই একদিন, যেদিন আকাশে মেঘ আর বিদ্যুতের খেলা চলছিল আর আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন রেশমি সুতো দিয়ে আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করলেন যে আকাশের বিজলী

আর নকল উপায়ে তৈরি বিদ্যুৎ একই। তিনি আরও দেখিয়ে দিলেন যে বিদ্যুৎ দু রকম, পজিটিভ আর নেগেটিভ।



এইবার আর একটি দুর্ঘটনার কথা বলছি যার ফলে ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ বিঘের নীল চাষ উঠে যায়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে রঙের জন্য নীলের চাষ করা হত। যাট বছর আগেও প্রায় ১৭ লক্ষ একর জমিতে নীল চাষ করে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দর নীল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জার্মান কৃত্রিম নীল তৈরি করে ফেলল যা দামেও সস্তা, রঙ পাকা ও ভাল, ঝামেলাও কম।

এই নীল ভারতবর্ষে আমদানি হওয়ায় ফলে নীলের চাষ উঠে গেল, সেই সঙ্গে অবশ্য নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও বন্ধ হয়ে গেল।

একশ বছরের কিছু আগে, ১৮৫৬ সাল, গুড ফ্রাইডের ছুটি। লণ্ডনে ছোট একটি ল্যাবরেটরিতে আঠারো বছরের একটি ছেলে কৃত্রিম কুইনিন তৈরি করবার চেষ্টা করছিল। চিটচিটে কালো আলকাতরার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। সেই ছেলেটির ধারণা ছিল যে আলকাতরার ভেতর থেকে ঐসব লুকনো জিনিস-গুলি বার করে সে কুইনিন তৈরি করবে।

আলকাতরা থেকেই তৈরি একটা জিনিসের দানা টেস্টটিউবের নীচে একদিন পড়ে ছিল। সেটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে ছেলেটি যেই খানিকটা অ্যালকোহল ঢেলেছে আর অমনি চমৎকার বেগুনি রঙে টেস্টটিউবটি ভরে উঠল। আলকাতরা থেকে এই প্রথম রঙ পাওয়া গেল। ছেলেটি সেই রঙের নাম দিল অ্যানিলিন মভ, আর তার নাম হল উইলিয়ম হেনরি পার্কিন। তারপর আলকাতরা থেকে বহুরকম রঙ ও অনেক উপকারী ওষুধও তৈরি করা গেছে।

চার্লস গুডইয়ারের নাম আজকাল সকলে জানেন। অন্তত তাঁর নামানুসারে একটি টায়ার বাজারে বিক্রয় হয়।

রবার যখন প্রথম আবিষ্কার করা গেল তখন কিন্তু সে রবার আজকের রবারের মতো ছিল না, ঠাণ্ডায় ফেটে যেত, গরমে গলে যেত, রবার দিয়ে সহজে কোনো কাজ করা যেত না।

গুডইয়ার রবার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন যে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে দিলে রবারকে মজবুত করা যায় কিনা। পরীক্ষা করবার সময় একদিন গন্ধক মেশানো

খানিকটা রবার হঠাৎ আগুনে পড়ে গেল আর গুডইয়ার যা চাইছিলেন তিনি হঠাৎই তাই পেয়ে গেলেন। রবারকে নিয়ে কাজ করবার নতুন একটা উপায় পাওয়া গেল। গুডইয়ার এই পদ্ধতির নাম দিলেন ভালকানাইজেসন। রোমানদের অগ্নিদেবতার নাম ভালকান, তাই থেকেই এই নাম দেওয়া হল।

ব্লটিং কাগজ আমাদের অনেক কাজে লাগে এবং এটিও হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল। লেখবার কাগজ তৈরি করতে হলে আগে মণ্ড তৈরি করতে হয়, তারপর তাতে মাড় দিতে হয়। ইংলণ্ডের বার্কশায়ারের এক কাগজ কলে একদিন কোনো একজন কর্মী কাগজের মণ্ডে মাড় দিতে ভুলে গেল, ফলে ঐ কাগজের ওপর লেখা অসম্ভব হল, লিখলেই লেখা চুপসে যায়। সেই কাগজ কলের মালিকের মাথায় হঠাৎ খেয়াল হল যে এই কাগজের ওপর লিখলে লেখা যখন চুপসে যাচ্ছে তখন সদ্য কাঁচা লেখার কালিও এই কাগজ শুষে নেবে। তিনি তখনি দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কাগজের ওপর লিখে সেই নতুন কাগজ দিয়ে চেপে ধরলেন, লেখা সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। তিনি কাগজের নাম দিলেন ব্লটিং পেপার, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলেন। সেই সমস্ত কাগজ ত বিক্রয় হয়ে গেলই উপরন্তু তিনি আরও অর্ডার পেলেন। এইভাবে ব্লটিং পেপার চালু হয়।

আজকাল ত ইউরেনিয়ামের নাম হামেসাই শোনা যায়। ইউরেনিয়াম থেকে যে অদৃশ্য রশ্মি বেরোয় তাও জানা গিয়েছিল দৈবক্রমে।

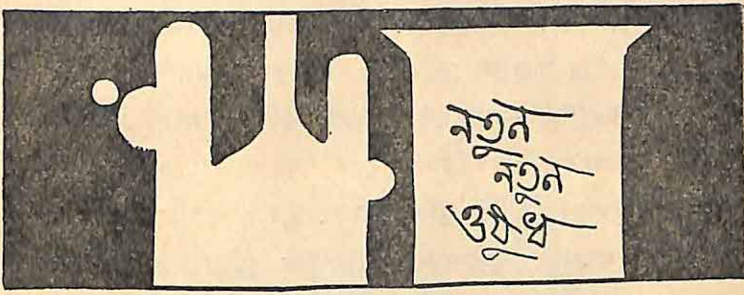
বেকেরাল নামে একজন বিজ্ঞানী প্যারিসে অধ্যাপনা করতেন

আর ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণা করতেন। একদিন তিনি কতকগুলি ফটোগ্রাফের প্লেট কালো কাগজে মুড়ে দেরাজে তুলে রাখলেন। সেই প্লেটগুলির ওপরে একটি চাবি ছিল আর চাবির ওপরে ছিল একখণ্ড ইউরেনিয়াম।

প্লেটগুলি রেখে তিনি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে সেই প্লেটের কথা মনে পড়ল। প্লেটগুলিতে তিনি কিসের যেন ছবি তুলে রেখেছিলেন কিন্তু ছবি ফোটানো হয় নি। কিন্তু ছবি ফুটিয়ে দেখা গেল যে প্লেটে একটা চাবির ছবি উঠেছে। এ ত ভৌতিক ব্যাপার, চাবির ছবি কোথা থেকে এল? চাবি অবশ্য প্লেটগুলির উপরে ছিল কিন্তু তার ছবি কি করে উঠল? অনেক পরীক্ষার পরে জানা গেল যে এ জন্য ঐ ইউরেনিয়াম খণ্ডটিই দায়ী।

জানা গেল যে ইউরেনিয়াম থেকে অদৃশ্য রশ্মি বেরোয় এবং তার জন্যেই ফটোগ্রাফের প্লেটে চাবির ছবি উঠেছে। এই ইউরেনিয়ামের জের টেনে মাদাম কুরি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম এবং রেডিয়ামের জের টেনে শেষ পর্যন্ত অ্যাটম বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে।

নিউটন লক্ষ্য করবার আগে অনেক আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়েছে, জেমস ওয়াট বাষ্পের ক্ষমতা আবিষ্কার করবার আগে অনেক কেটলিতে অনেক জল ফুটেছে কিন্তু কেন এমন ঘটছে লক্ষ্য করবার যার চোখ আছে সে-ই নতুন কিছু আবিষ্কার করবার গৌরব অর্জন করতে পারে॥



ছোট্ট একটি মেয়ে। কতই বা আর বয়স হবে, এই আট কি নয়। সবে মাত্র সেলাই করতে শিখেছে। একদিন বসে বসে এক মনে সেলাই করছে কিন্তু কি একটা শব্দ শুনে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে আর অমনি আঙুলে প্যাট করে ছুঁচ ফুটে গেল। মেয়েটি আঙুলটা চুষে নিল, রক্ত পড়া থেমে গেল, তারপর সে যেমন সেলাই করছিল তেমনি সেলাই করতে লাগল।

এইভাবে ছুঁচ ত কতজনের আঙুলে ফোটে কিন্তু কিছুই হয় না। মেয়েটির বেলায় কিন্তু উল্টো ফল হল। সেই রাতেই বেচারীর ভীষণ জ্বর হল। ডাক্তার বাবু এসে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, তার সমস্ত রক্ত বিষিয়ে গেছে, বাঁচে কিনা সন্দেহ। ভয়ে ত মেয়েটির মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

মেয়েটির বাবা কিন্তু কি যেন ভাবলেন। তিনি ছিলেন মস্তবড় একজন রাসায়নিক, জার্মানির সবচেয়ে বড় ওষুধ কম্পানির তিনি ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম গেরার্ড ডোম্যাক। ডোম্যাক

তখন একটা ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে ইঁদুরের রক্ত বিষিয়ে গেলে এবং সেই ওষুধ খাইয়ে দিলে ইঁদুরগুলি মরে না ; কিন্তু ঐ ওষুধ না খাওয়ালে ইঁদুর মরে যায়।

তাই মেয়ের অসুখে ডোম্যাক একেবারে নিরাশ হলেন না। তিনি ঠিক করলেন ওষুধটা মেয়ের ওপর পরীক্ষা করে দেখা যাক। তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় অল্প পরিমাণে সেই ওষুধ খাওয়াতে লাগলেন।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি ভেবেছিলেন, নিশ্চয় খুব খারাপ খবরই শুনবেন। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে তিনি অবাক। মেয়ে অনেক ভাল আছে, বিপদ কেটে গেছে।

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এমন ত দেখা যায় না। এমন অসম্ভব কি করে সম্ভব হল। কিছু বুঝতে না পেরে তিনি ডোম্যাকের মুখের দিকে চাইলেন। ডোম্যাক তখন মিটি মিটি হাসছেন।

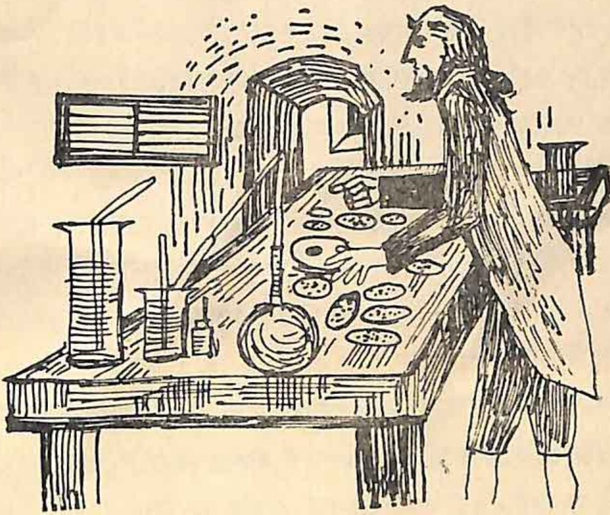
ডোম্যাক তখন ডাক্তারবাবুকে সব খুলে বললেন। ডাক্তার সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তাহলে এমন ওষুধও আবিষ্কৃত হল যে ওষুধ খেয়ে জবাব-দেওয়া রোগীও বাঁচবে। যাই হক মেয়েটি ক্রমে সেরে উঠল।

ডোম্যাক যে ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন সেই ওষুধের নাম সালফানিল অ্যামাইড, প্রণ্টোসিল নামে বাজারে বিক্রি হত। ঐ একটি ওষুধ থেকে নিউমোনিয়া, মেনেনজাইটিস, রক্তদুষ্টি, পেটের পীড়া, নানারকম রোগ সারে। পরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঐ একটি ওষুধের নানা ভাগ বেরিয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বহু আহত সৈনিকের হাত পা কেটে বাদ

দিতে হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঐ ওষুধের জন্য হাত পা খুব কমই কাটতে হয়েছিল। তবে একটা কথা, এই ওষুধের একটিও বড়ি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে খেলে বিপদ হতে পারে।

এইবার আর একটি আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কারের কথা বলি।



লণ্ডনের একটি বিখ্যাত হাসপাতাল, নাম সেণ্ট মেরিজ হসপিট্যাল। সেই হাসপাতালের একজন ডাক্তার অবসর সময়ে গবেষণা করেন নানারকম জীবাণু নিয়ে। এই জন্য গোল গোল চ্যাপ্টা কাঁচের ডিসে তিনি জীবাণুর চাষ করেন।

একদিন বাড়ি যাবার সময় এই রকম একটি কাঁচের ডিসে স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে ভীষণ মারাত্মক জীবাণু জন্মাতে দিয়ে চলে

Acc No- 14739

গেলেন। পরদিন সকালে হাসপাতালে এসে দেখলেন যে সমস্ত ডিসটি ঐ জীবাণুতে ভর্তি হয়ে গেছে কিন্তু ছোট একটা গোল জায়গায় কোনো জীবাণু নেই। এরকম দেখা যায় না, ঐ জীবাণু যখন জন্মায় তখন সমস্ত ডিসটা ভর্তি হয়ে থিক থিক করতে থাকে।

কিন্তু এমন কেন হল ? তিনি ভাল করে দেখলেন, যে জায়গাটায় জীবাণু নেই তার ঠিক মাঝখানে হলদে রঙের একটা বিন্দু যেন ভাসছে। ডাক্তারবাবু খুব সাবধানে হলদে রঙের বিন্দুটি তুলে নিয়ে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেটি একরকম ছাতা। ল্যাবরেটরিতে নানা কাজে হফ নামে যে জিনিসটি ব্যবহৃত হয় তাইতে এই ছাতা পড়ে। এই ছাতার নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম, হাওয়ায় উড়ে এসে কোন সময় ডিসে এসে পড়ে থাকবে। সেই ছাতা থেকে একরকম হলদে রস বেরিয়ে কাছাকাছি জীবাণুগুলিকে মেরে ফেলেছে।

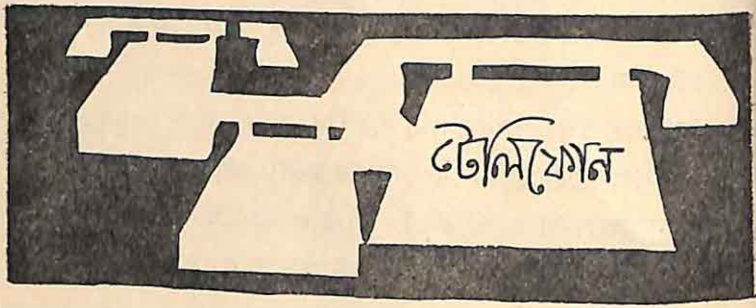
ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৮ সালে আর সেই ডাক্তারবাবুর নাম আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। ফ্লেমিং এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখলেন আর ঐ ছাতার নমুনা রক্ষা করবার ব্যবস্থা করলেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। তখন ঐ সালফানিল অ্যামাইড প্রচুর পরিমাণে তৈরি হত জার্মানিতে আর গুণেও ছিল শ্রেষ্ঠ। জার্মানদের মতো অত ভাল ওষুধ আর কেউ তৈরি করতে পারত না। যখন জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সালফানিল অ্যামাইড আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আর একটি ঐ রকম ভাল ওষুধের খোঁজ চলতে লাগল।

অস্ট্রেলিয়ার একজন বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি আর পোল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী অধ্যাপক চেন, এই দুজনে পেনিসিলিয়াম নোটেটামকে খুঁজে বার করলেন। এঁদের সঙ্গে ফ্লেমিং সাহেবও যোগ দিলেন।

ইংলণ্ডের ওপর তখন বোমা পড়বার ভয়। তাই তিনজনে সেই পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নিয়ে আমেরিকায় গেলেন। আমেরিকার অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান এঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তখন এঁরা তিনজনে মিলে অনেক গবেষণা করে পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কার থেকে প্রেরণা আর উৎসাহ পেয়ে আরও নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন। যার ফলে আবিষ্কৃত হল যক্ষার ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন আর টাইফয়েডের ওষুধ ক্লোরোমাইসিটিন। এগুলি ছাড়া নতুন অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে ওষুধও যত নতুন নতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে, তত নতুন নতুন রোগও এসে জুটছে। দু'জনে যেন দু'জনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে; কে কাকে হারাতে পারে॥



টেলিফোনে কথা বলে নি এমন লোক খুব কমই আছে। সত্যিই আজকাল টেলিফোন নইলে চলে না। যারা ব্যবসা করেন তাদের টেলিফোন খুব বেশি দরকার। এমন কি সাধারণ লোকেরও একটা টেলিফোন থাকলে কাজের খুব সুবিধা হয়।

টেলিফোনের প্রথম সুবিধা হল যে এই যন্ত্র সময় বাঁচায়। ডাক্তার বাবুকে তাড়াতাড়ি খবর দিতে হবে কিংবা স্টেসন থেকে কোন ট্রেনখানা কখন ছাড়বে কিংবা খবরের কাগজের অফিসে একটা জরুরী খবর পাঠাতে হবে, এই সব ব্যাপারে টেলিফোন খুব দরকারী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাক্তারখানা, রেলস্টেসন বা খবরের কাগজের অফিসে যেতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু টেলিফোন করে দিলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়, সময়ও অনেক বাঁচে।

টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজানডার গ্রেহাম বেল নামে একজন সাহেব। তিনি জন্মেছিলেন এডিনবরা শহরে ১৮৪৭

সালে। লেখাপড়া শিখেছিলেন এডিনবরা আর লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

টেলিফোনের আগে টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু টেলিগ্রাফে সরাসরি কথা বলা যায় না। টেলিগ্রাফে কিছু খবর পাঠাতে হলে একটা সাংকেতিক ভাষা শিখতে হয়, সেই সাংকেতিক শব্দ না জানলে টেলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। টেলিফোন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এই অসুবিধা দূর হয়েছে। এখন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যায়।

গ্রেহাম বেলের বাবা মূক-বধিরদের শিক্ষা দেবার জন্যে একটা উপায় খুঁজছিলেন। মূক-বধিররা কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে পায় না, তাদের কিছু শেখানো কঠিন। তিনি একটা সহজ উপায় খুঁজছিলেন যার দ্বারা মূক-বধিরদের লেখাপড়া শেখানো যায়।

গ্রেহাম বেল নিজেও বাবার পদ্ধতি যাতে আরও ভাল করা যায় সেই চেষ্টা করতে লাগলেন।

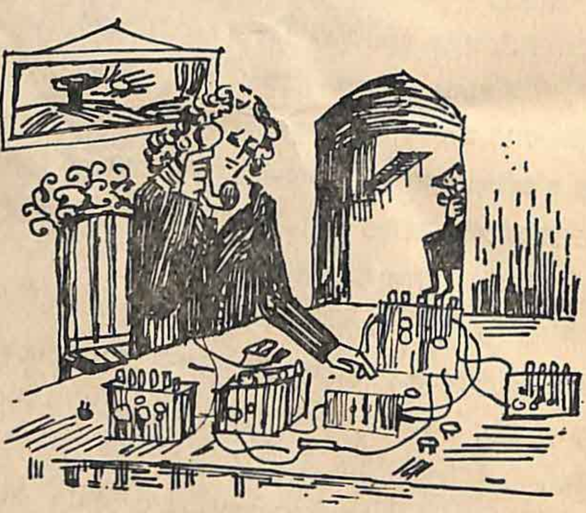
বলতে কি তিনি নিজেও কিছু কিছু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর খুব সুনাম হল, দেশ-বিদেশে অনেকে তাঁর নাম শুনল। ভাল একটা চাকরি পেয়ে তিনি সুদূর ক্যানাডায় চলে গেলেন।

বেল চেষ্টা করছিলেন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে যাতে মানুষের গলার আওয়াজ দেখতে পাওয়া যাবে আর সেই দেখতে-পাওয়া-আওয়াজ দেখে মূক-বধিররা লেখাপড়া শিখবে।

ক্যানাডা থেকে বেল এলেন আমেরিকার বোসটন শহরে নতুন

আর একটা চাকরি নিয়ে। চাকরি মানে শিক্ষকতা। তিনি হলেন কলেজের অধ্যাপক। মানুষের গলার স্বর সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য শেখাতেন ছাত্রদের আর সেই সঙ্গে গবেষণাও করতেন।

মূক-বধিরদের জন্যে বেল সব সময়ে চিন্তা করতেন, তিনি ভাবতেন বেচারীরা মনের কথা বলতে পারে না, অপরের কথা, গান, পাখির কাকলি শুনতে পায় না। এদের জন্যে শীগগির কিছু করা দরকার। কিন্তু চাকরী করতে করতে বেশিক্ষণ গবেষণা করার সময় পাওয়া যেত না। তাই তিনি একদিন চাকরিটা ছেড়েই দিলেন।



বেল নিজে মূক বধিরদের জন্যে একটা ইসকুল খুললেন। যাতে তারা কথা বলতে পারে বা কথা শুনতে পায়, এমন একটা যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

দেখতে দেখতে ছয় বছর কেটে গেল। এর মধ্যে তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করে ফেলেছেন। সেই যন্ত্র দিয়ে বধিরদের কথা শোনানো যাবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

যন্ত্রটার ছিল দুটো অংশ। একটাতে কোনো আওয়াজ করবার জন্যে আর অপরটা দিয়ে সেই আওয়াজ শোনবার জন্যে।

এই যন্ত্রটার দুটো অংশ তিনি পাশাপাশি দুটো ঘরে রাখতেন, এক ঘরে থাকতেন তিনি নিজে আর অপর ঘরে তাঁর সহকারী। তাঁর নাম ওয়াটসন।

একদিন দুজনে দু ঘরে বসে পরীক্ষা করছেন, এমন সময় একটি যন্ত্রের মধ্যে কি যেন আটকে গেল। এই যন্ত্রটি ছিল ওয়াটসন যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে। ওয়াটসন সেটিকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন আর তখনি পাশের ঘর থেকে বেল ছুটে এলেন। ওয়াটসন যখন তাঁর আটকে-যাওয়া যন্ত্রটি ছাড়াবার চেষ্টা করছিলেন তখন বেল যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে তাঁর যন্ত্রে খট খট করে আওয়াজ হতে থাকে। বলতে গেলে তখনি টেলিফোনের জন্ম হল।

বেলের মাথায় তখনি অন্য চিন্তা ঢুকল। তিনি দুই ভাগে ভাগ করা যন্ত্রকে অন্যভাবে দেখতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন হয়ত এই যন্ত্র দিয়ে অপরের সঙ্গে কথা বলাও যাবে। তিনি তখন যন্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন।

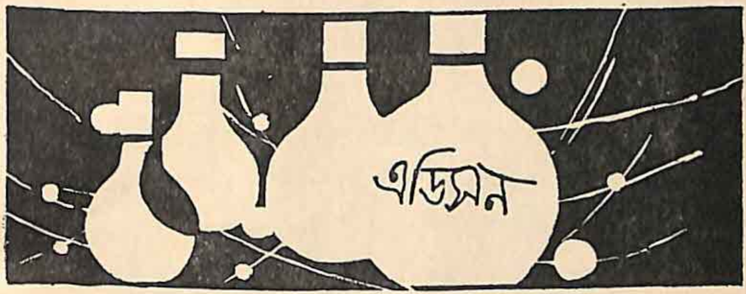
কিছুদিন পরে। বেল ও ওয়াটসন আলাদা দুটি ঘরে যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করছেন, দুটি যন্ত্র কিন্তু তার দিয়ে যুক্ত। বেল তাঁর যন্ত্রে মুখ দিয়ে হঠাৎ বললেন ঃ

—মিস্টার ওয়াটসন অনুগ্রহ করে এখানে আসুন, দরকার আছে।

—শুনতে পেয়েছি, বলেই ওয়াটসন ছুটে বেলের ঘরে এলেন।

সেদিন মার্চ মাসের ১০ তারিখ, ১৮৭৬ সাল। অ্যালেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেলের বয়স ২৯ বৎসর ৭ দিন।

সেই বছর ফিলাডেলফিয়া শহরে খুব বড় একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। বেল তাঁর টেলিফোন যন্ত্র সেই প্রদর্শনীতে নিয়ে গেলেন। সেই প্রদর্শনীতেই বেল ও তাঁর টেলিফোন যন্ত্র পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠল॥



বিজ্ঞানী আছেন দু' রকম। এক রকম হলেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন, যেমন গ্যালভানি তড়িৎ আবিষ্কার করলেন, তারপরে আর কেউ কেউ তড়িৎ কি, কি তার গুণ এইসব আবিষ্কার করলেন। আর এক রকমের বিজ্ঞানী হলেন যাঁরা তড়িতের সেই-সব গুণকে কাজে লাগিয়ে আলো জ্বালালেন, ট্রেন চালালেন, কলকারখানা বসালেন।

টমাস আলভা এডিসন হলেন এই দ্বিতীয় দলের বিজ্ঞানী। তিনি বিজ্ঞানের নানা তথ্যকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছেন। সেই সব আবিষ্কারে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে তিনি আড়াই হাজার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আজকালকার সিনেমা, গ্রামোফোন, ইলেকট্রিক বাল্ব, ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তাঁরই আবিষ্কার।

খুব ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু আবিষ্কার করার বুদ্ধি সবসময় তাঁর মাথায় খেলত। সেজন্য তিনি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, বইপত্র,

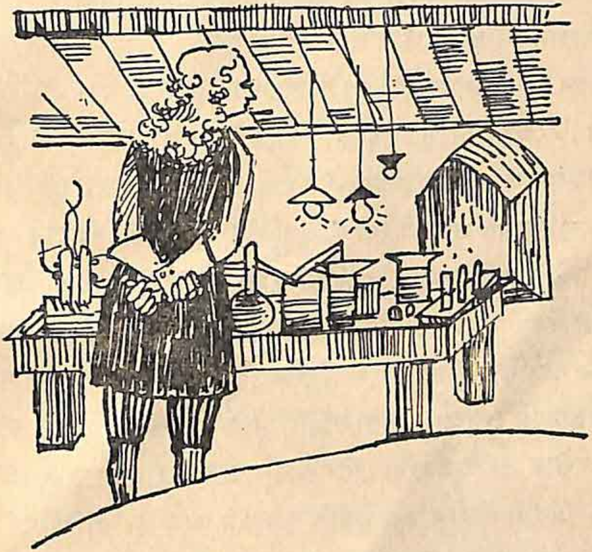
রাসায়নিক দ্রব্য, এইসব কিনতেন। কিন্তু সেজন্য যে পয়সার দরকার হত তার জন্যে বাপ-মায়ের কাছে হাত পাততেন না।

এডিসন স্কুলে পুরো এক বছরও পড়েন নি। তা বলে কিন্তু পড়াশোনা কিছু কম করেন নি। শেখবার জন্যে বালক বয়সেই তিনি কী কঠোর খাটুনি খেটেছেন তার গল্প শোনো।

তাঁদের বাড়ির বাগানে যে সব ফলফুল শাকসব্জি হত বালক এডিসন সে সব বাজারে নিয়ে যেয়ে বিক্রি করতেন। এক বছরে তিনশ' ডলার জমালেন। অর্ধেক টাকা মাকে দিলেন, বাকি টাকা দিয়ে বই কিনলেন আর পরীক্ষা করবার জন্যে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য কিনলেন। সেই সময় আবার তাঁদের শহর পোর্ট হুরণ থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত ট্রেন চলতে শুরু করেছে। এডিসনের সব্জির ব্যবসা অনেক বড় হয়েছে। বাগানের সব্জিতে আর কুলোচ্ছে না, তাই তিনি ডেট্রয়েট থেকে আরও সব্জি আনাতে লাগলেন। কিন্তু এই সব্জি আনার খরচ তো তুলতে হবে, তাই তিনি ট্রেনে একখানা খবরের কাগজ বেচতে লাগলেন। সে কাগজখানা চলল না। তখন তিনি রেল কোম্পানীর অনুমতি নিয়ে রেলের মাল নিয়ে যাবার একখানা খালি গাড়িতে একটা ছোট ছাপাখানা বসালেন। চলতি ট্রেনে সেই ছাপাখানায় ছাপতে লাগলেন একখানা খবরের কাগজ। কাগজের নাম 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক হেরাল্ড'। তিনি নিজেই সেই কাগজের মালিক, সম্পাদক, রিপোর্টার, হকার সবকিছু। চলতি ট্রেনে এমন খবরের কাগজ আর কখনও বেরোয় নি।

সেই ছাপাখানার একধারেই তিনি একটি ল্যাবরেটরি বসিয়েছিলেন। ফাঁক পেলেই সেখানে কাজ করতেন। এরই মধ্যে

চলত স্টেশনে স্টেশনে কাগজ বিক্রি, ফল বিক্রি, ডেট্রয়েটে পৌঁছে শহরের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা, বাজারের জিনিসপত্তর কেনা, খবরের কাগজের নানা কাজ। সেই ছোট ছেলে সব কাজ একা সামলাত।



একদিন ট্রেন লেট করেছে। ড্রাইভার খুব জোরে ইঞ্জিন চালিয়েছে। তখনকার ট্রেন ত আর এখনকার মতো ছিল না, তাই জোরে ট্রেন চলায় গাড়িগুলি দুলতে লাগল, আর ওদিকে এডিসনের ছোট্ট ল্যাবরেটরির তাক থেকে রাসায়নিক দ্রব্য ভর্তি শিশি বোতল পড়তে লাগল। তাকে ছিল এক শিশি ফস্‌ফরাস। সেটাও পড়ে গেল। সেই ফসফরাস আর কিসের সঙ্গে মিশে কামরাটিতে আগুন ধরে গেল। ড্রাইভারকে বাধ্য হয়ে ট্রেন থামাতে হল। একে ট্রেন

লেট, তায় আবার আগুন ধরেছে, ট্রেন ফের থামাতে হয়েছে। গার্ড সাহেব এসে সেই কামরা থেকে এডিসনের ছাপাখানা, কাগজ, শিশি বোতল, যন্ত্রপাতি সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে ত দিলেনই আর শেষে তার কানটি এমন জোরে মলে দিলেন যে শেষ পর্যন্ত এডিসন কালা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স পনেরো।

এরপর এডিসনের টেলিগ্রাফ শেখবার ইচ্ছে হল। তিনি তাঁর পাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসিয়ে টরে-টক্কা আওয়াজ তুলতেন।

চলন্ত ট্রেনের সামনে থেকে এক স্টেশন মাষ্টারের ছোট মেয়েকে এডিসন বাঁচিয়েছিলেন। সেজন্যে সেই স্টেশন মাষ্টার এডিসনকে টেলিগ্রাফের কাজ শেখাতে রাজি হলেন। তিন মাসের মধ্যে এডিসন সব কিছু কাজ শিখে নিলেন। তিনি সেই রেল লাইনেই একটা চাকরি পেলেন। চাকরিটা ছিল রাতে। একটা কাজ ছিল ঘণ্টায় ঘণ্টায় তদারক করা স্টেশনের সব কর্মীরা জেগে আছে কিনা। এডিসন একটা মজার কল তৈরি করলেন তা দিয়ে প্রতি ঘণ্টার খবর জানা যেত, আর এই প্রতি ঘণ্টার খবর ঠিক রাখবার জন্য কর্মীদের জেগে না থেকে উপায় ছিল না। ওদিকে এডিসন নিজে মজা করে ঘুমোতেন।

এডিসন একদিন ধরা পড়ে গেলেন। চাকরিটা তাঁর গেল কিন্তু তাঁর সেই মজার কল দিয়ে আজও কাজ চালানো হচ্ছে।

এডিসনের বয়স তখন ২২ বৎসর, তিনি সেদিন বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছেছেন। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি, কাছে একটা পয়সাও নেই। তিনি খবর শুনলেন যে শেয়ার

মার্কেটের টেলিফোনের বড় কলটি বিগড়ে গেছে। তিনি তখনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। দু ঘণ্টা খেটে, যন্ত্রটি তিনি চালু করে দিলেন। সেখানে একটা ভাল চাকরিও জুটে গেল।

সেখান থেকে গেলেন আমেরিকার সবচেয়ে বড় টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে। এখানে তিনি তাঁর একটি আবিষ্কারের জন্যে অনেক টাকা পেলেন। এইবার এডিসনের বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। তিনি সেই টাকা দিয়ে নিজের একটি কারখানা করলেন। অনেক উঠতি পড়তির পর সেই কারখানা অনেক বড় হল। এডিসনও নিত্য নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে লাগলেন। সেই সব যন্ত্রে আমাদের অনেক উপকার হতে লাগল। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যেরও অনেক কিছু তিনি আবিষ্কার করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইলেকট্রিক বাল্‌ব আবিষ্কার করলেন আর নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮৮২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৮৫টি বাড়িতে বিজলী বাতি জ্বালালেন।

এডিসন যেন ইচ্ছেমত যাদুকরের মতো নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারতেন। তবে তিনি বলেছেন যে সাফল্যের মূলে আছে কঠোর পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া কিছুই হয় না।

এডিসনের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আর মৃত্যু ১৮ই অক্টোবর ১৯৩১ ॥

মাইকেল ফ্যারাডে

ইংলণ্ডে যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন আইজ্যাক নিউটন, চার্লস্ ডারুইন, লর্ড রাদারফোর্ড ইত্যাদি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁর মতো এমন সরল সহজ ও সাধাসিধে বিজ্ঞানী খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুব সাধারণ ও দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন সোজা কথায় যাকে বলে কামার, কাকাদের মধ্যে কেউ ছিল মুচি, কেউ মুদি, কেউ চাষী আবার কেউ কেরানিও ছিল। তাঁর এক ভাই জলের কল সারিয়ে বেড়াতো, অপর ভাইদেরও পরিচয় দেবার মতো পেশা ছিল না। কিন্তু এই পরিবারেরই মাইকেল ফ্যারাডে কি রকম করে যেন উৎরে গেল।

বালক মাইকেলের লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ ছিল না কিংবা তাঁর বিশেষ কোনো মেধাও ছিল না। সবেমাত্র কিছু লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখতে না শিখতেই তাঁকে বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। মাইকেলের

কথা বলবার একটু দোষ ছিল। তিনি 'র' উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাঁর বড় ভাই রবার্ট তাঁরই সঙ্গে একই শ্রেণীতে পড়তেন, কিন্তু তিনি দাদাকে 'রবার্ট' বলে ডাকতে পারতেন না, বলতেন 'ওবার্ট'। শিক্ষয়িত্রী কিন্তু এজন্য ভীষণ চটে যেতেন, কি রকম ছেলে যে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না। এমন ছেলেকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া উচিৎ। সত্যসত্যই তিনি নিজেই একদিন রবার্টকে একটি আধ-পেনি দিয়ে বললেন যেন সে একটি বেত কিনে এনে তাই দিয়ে সকলের সামনে মাইকেলকে ভীষণ মারে।

রবার্ট কিন্তু ভাইকে ভালবাসত, সকলের সামনে মারবার মতো নিষ্ঠুর সে ছিল না। সে সেই আধ-পেনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে একেবারে মায়ের কাছে বাড়ী যেয়ে হাজির। মাকে সব কথা বলাতে ফল এই হল যে তিনি দু'ভাইকেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। এদিকে ফ্যারাডেদের অবস্থা একেই ত খারাপ ছিল, আরও খারাপ হয়ে পড়ল। রবার্ট ও মাইকেলের বাবা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য লণ্ডনে এলেন। কিন্তু স্থান পরিবর্তনে ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হল না। এই সময়ে মাইকেলকে একদিন মাত্র পাঁউরুটি খেয়ে এক সপ্তাহ কাটাতে হত। তিনি সেই রুটিখানি গোড়াতেই চোদ্দটি ভাগ করে কেটে নিতেন, একখানি ভাগ সকালে অপর একখানি ভাগ রাত্রে। এই করে সপ্তাহ কাটাতেন। পেট না ভরলেও কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন।

মাইকেলের তেরো বৎসর বয়স হতেই তাঁর বাবা তাকে একটি কাজ জুটিয়ে দিলেন। কাজটি হল বইয়ের দোকানে। লণ্ডনে ২নং ব্ল্যাণ্ড ফোর্ড ষ্ট্রিটের জর্জ রিবোর এই বইয়ের দোকান প্রায় ফ্যারাডের

মতোই চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। জর্জ রিবো বই বিক্রয় করতেন, কাগজ কলম পেন্সিল বিক্রয় করতেন, বই বাঁধাতেন আবার খবরের কাগজও বিক্রয় করতেন। মাইকেলের কাজ ছিল গ্রাহকদের বাড়ী বাড়ী এই কাগজ পেঁছে দেওয়া, আবার পড়া হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা। এই কাজের জন্য মাইকেলকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। কিন্তু সে সবই সে হাসিমুখে সহ্য করত।

এক বৎসর কাজ করবার পর মাইকেলের মালিক মাইকেলের কাজে খুব খুসি হলেন এবং তিনি মাইকেলকে দপ্তরীর কাজ শিখ্‌তে দিলেন ও এটা শেখবার জন্য পাওনা অর্থ তিনি মাপ করে দিলেন।

এই কাজটি মাইকেলের বেশ মনঃপুত হল, কারণ দোকানে নানারকম বই ত বাঁধাতে আসত, তিনি সেই সব বই পড়বার সুযোগ পেতেন। বিজ্ঞানের বইগুলির প্রতিই তিনি বিশেষ করে আকৃষ্ট হ'তেন। তিনি শুধু পড়েই ক্ষান্ত থাকতেন না। যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সস্তায় করা যায় সেগুলি তিনি বাড়ীতে করতেন এবং ছোটখাটো কয়েকটা যন্ত্র তিনি প্রস্তুত করেও ছিলেন।

একদিন লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রিট দিয়ে বেড়াবার সময় একটি বিজ্ঞাপন মাইকেলের চোখে পড়ল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল টেটাম নামে কোনো এক বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, প্রবেশ মূল্য এক শিলিং। এই বক্তৃতা শোনবার জন্য মাইকেলের খুব আগ্রহ হল, কিন্তু চাই অর্থ ও ছুটি। দুটোরই অভাব। যাই হোক মাইকেলের আগ্রহ দেখে রিবো সাহেব তাঁকে ছুটি দিলেন আর প্রবেশ মূল্যের এক শিলিং তার বড়ভাই রবার্ট তাকে সংগ্রহ করে দিলেন। এই বক্তৃতা ফ্যারাডের খুব ভাল লেগেছিল

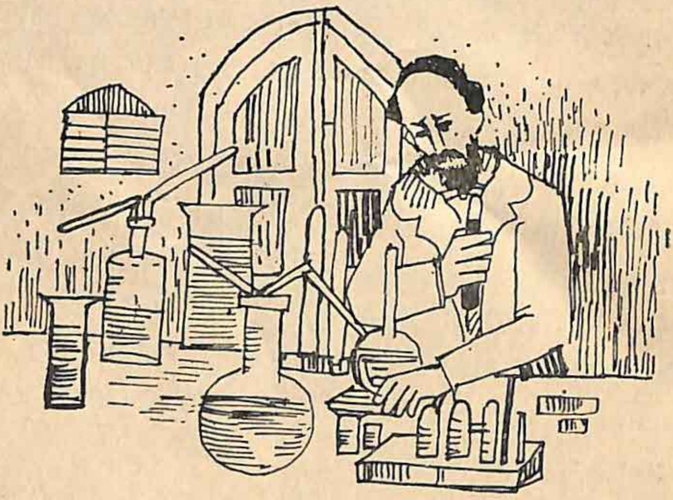
এবং একজন বৈজ্ঞানিক হবার জন্য মনে মনে খুব আগ্রহ হল।

রিবোর দোকানে দপ্তরীর কাজ শেখা শেষ হয়ে যেতে ফ্যারাডে অন্যত্র একটি চাকরী নিলেন কিন্তু সেখানে বনিবনা না হওয়ায় সে চাকরি ছেড়ে দিলেন। এই সময়ে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল। মাইকেলেরও আয় নেই, তাই তাঁদের পরিবারকে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হল।

'সফলতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে কিন্তু কৃতকার্য হবে এমন আশা কোরোনা।'—এই ছিল মাইকেল ফ্যারাডের জীবনের আদর্শবাক্য। এই আদর্শবাক্য মনে রেখে মাইকেল ফ্যারাডে একদিন তখনকার বিলেতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সার হামফ্রে ডেভীর কাছে একখানি চিঠি লিখলেন। চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন একখানি সুন্দর খাতা। মাইকেল ইতিমধ্যে হামফ্রে ডেভীর কিছু কিছু বক্তৃতা শুনেছিল। সেই বক্তৃতা শুনে মাইকেল যা বুঝেছিল তাই সে গুছিয়ে পরিষ্কার করে লিখে খাতাখানি বাঁধিয়ে হামফ্রে ডেভীর কাছে পাঠিয়ে দিলে। মাইকেল বিনয়ী ছিল কিন্তু ভীতু ছিল না। সে অনুরোধ করল যে তাঁর ল্যাবরেটরীতে যেন তাকে যে কোনো একটি কাজ দেওয়া হয়।

মাইকেল উত্তরের আশা করেন নি কিন্তু উত্তর ত তিনি পেলেনই সেই সঙ্গে চাকরি। চাকরি হল ল্যাবরেটরীর মেঝে পরিষ্কার করা, টেবিল চেয়ার ঝাড়া, শিশিবোতল সাফ্ রাখা ও অন্যান্য ফাইফরমাস। ফ্যারাডে কিন্তু এই চাকরিতেই খুসি। একজন বড়লোকের কাছে ত থাকা যাবে।

কিছুদিন পরে মাইকেলের আগ্রহ দেখে ডেভী সাহেব নিজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তার সাহায্য নিতে লাগলেন। ফ্যারাডে খুব দ্রুত কাজ শিখে নিলেন। ডেভী সাহেব খুব সন্তুষ্ট হলেন এমন কি তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণে ফ্যারাডেকে সহকারীরূপে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপের প্রধান প্রধান সহরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া।



ফ্যারাডে দীর্ঘ দু' বৎসর হামফ্রে ডেভীর সঙ্গে ভ্রমণ করলেন, নানা অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন সেই সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি তাঁর বেড়ে গেছে। তিনি ফিরে এসে রয়েল ইনস্টিটিউটে

একটি চাকরি পেলেন। এই রয়েল ইনস্টিটিউটেই হামফ্রে ডেভীর ল্যাবরেটরী। তিনি এখানে গবেষণা করতেন ও মাঝে মাঝে ছাত্রদের পড়াতেনও। তিনি যেন রয়েল ইনষ্টিটিউটের যন্ত্রপাতি ও রসায়নের বোতল আর টেস্ট টিউবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু তাঁর বেতন বেশী ছিল না অথচ তিনি রয়েল ইনষ্টিটিউটকে এত ভালবাসতেন যে বেশী বেতনের ও সম্মানজনক পদ অন্যত্র তিনি গ্রহণ করেন নি। এইখানেই কাজ করতে করতে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করেন, চুম্বককে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তাঁর সেদিনকার সেই আবিষ্কারের ফলে ডায়নামো আবিষ্কার হল যার জন্য আজ ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, রাস্তায় ট্রাম গাড়ী চলছে।

মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁকে দেখে কিন্তু তা বোঝবার উপায় ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন তিনি রয়েল ইনষ্টিটিউটে কাজ করছেন, এমন সময়ে একজন নবীন বৈজ্ঞানিক সেখানে এল। সে কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডেকে চিনত না। ময়লা পোষাক পরা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে নবীন বৈজ্ঞানিকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ

"তুমি বুঝি এখানে অনেকদিন কাজ করছ ?"

"হ্যাঁ তা অনেকদিন বৈকি !"

"তুমি বুঝি এই ল্যাবরেটরী তদারক কর ?"

"তা প্রায় সেই রকমই হবে।"

"মাইনে পত্তর ভাল পাও ত ?"

"আর কিছু বেশী পেলে ভাল হয়।"

"বেশ, বেশ, তা তোমার নাম কি ?"

"মাইকেল ফ্যারাডে।"